Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 252–259
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মনোজ মিত্রের সমাজ ভাবনামূলক নির্বাচিত নাটক : বিষয় ও বিশ্লেষণ

জয়ন্তী রাজোয়াড়
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : jayantirajwar2016@gmail.com

Keyword
পারিবারিক সমস্যা, শোষিত সমাজ, লোভ, প্রতিহিংসাপরায়ন, প্রতিবাদ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সুন্দর সমাজের পরিকল্পনা।

Abstract
আধুনিক সমাজের রূপকার নাট্যকার মনোজ মিত্র। নাট্যজগতে এক অতি পরিচিত নাম মনোজ মিত্র। তিনি রাজনীতির কথা সরাসরি বলেননি কিন্তু সমাজের সব ধরণের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকের মধ্যে। তিনি বড় করে দেখেছেন চারপাশের মানুষজনকে। তাই তাঁর নাটকগুলোতে সমাজের শ্রেণির কথার সাথে সাথে পরিবার বা ব্যক্তিচরিত্রের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজভাবনার অনেক নাটক রচিত হয়েছে তাঁর হাতে; তবু আমি তাঁর জনপ্রিয় তিনটি নাটককে বিশ্লেষণের তালিকায় রেখেছি। 'নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ড থেকে 'চাক ভাঙা মধু', অলকানন্দার পুত্রকন্যা' এবং দ্বিতীয় খণ্ড থেকে 'সাজানো বাগান'। 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'সাজানো বাগান' এই দুটি নাটকে শ্রেণিসংগ্রামের লড়াই, শোষিত মানুষের শাসকদের প্রতি বিদ্রোহ অর্থাৎ টিকে থাকার লড়াই প্রাধান্য পেয়েছে। শোষিত সমাজের প্রতিনিধি হয়েছে– মাতলা, জটা, বাদামী ও বাঞ্ছার মতো বাস্তব চরিত্রগুলো। জমিদারশ্রেণির নির্মম অত্যাচার তাঁর এই দুটি নাটকে লক্ষ্য করা যায়। শাসকগোষ্ঠীর বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাই– অঘোর এবং ছকড়ি-নকড়ি চরিত্রের মধ্যে। তাঁর অপর নাটক 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'তে মমতাময়ী মাতার চিত্র তুলে ধরেছেন। অলকা নিজে গর্ভধারিণী জননী না হয়েও পালিত পুত্রকন্যাদের বটবৃক্ষের মতো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। সন্তানদের বাৎসল্যপ্রেম উজাড় করে দিয়েছেন। তার রুগ্ন স্বামীকেও অনাদরে রাখেননি, নিজে সংসারের হাল ধরে সবাইকে সুখী রাখার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায় এই নারী। এই তিনটি নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেতা-নাট্যকার মনোজ মিত্রের সমাজভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করবো।

Discussion

মনোজ মিত্র একজন প্রখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র ও নাট্য অভিনেতা। নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রের জন্ম ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার খুলনার ধূলিহর গ্রামে। পিতা অশোক কুমার মিত্র। দেশভাগের পর তাঁরা এপার বাংলা চলে আসেন। এখানে পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি থিয়েটার এবং অভিনয়ের প্রেম ত্যাগ করতে পারেনি। আর এই প্রেমেই তাঁকে গড়ে তোলে নাট্যজগত এবং অভিনয় জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৬ - ১৯৫৭ এই সময়ে তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ‘সুন্দরম’ নাট্যদল গড়ে তুলেছিলেন। এই দলের প্রথম অভিনীত নাটক ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’। এরপর তিনি নাটক রচনায় হাত দেন। তিনি প্রথম একাঙ্ক নাটক লেখেন ১৯৫৯ সালে, নাটকটি হল ‘মৃত্যুর চোখে জল’। তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাননি, একটার পর একটা জনপ্রিয় নাটক তিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো একঘেয়েমি নয়, বিভিন্ন ধরণের নাটক লিখে দর্শকসমাজের মনে নাড়া দিয়েছেন।

তাঁর নাটকের একটি প্রধান দিক হল– সমাজ। সামজকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। তথা নাট্যকার মনোজ মিত্র এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের রাজনৈতিক শোষণ পীড়ন, দুর্নীতি, অত্যাচার থেকে শুরু করে পারিবারিক বিভিন্ন ধরণের সমস্যাকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার মনোজ মিত্র ১৯৮৫ তে ‘কৃষ্টি’ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে বলেছিলেন–

> “আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।”[১]

তাঁর এই ধরনের সমাজচেতনামূলক কয়েকটি নাটক হল– ‘চাক ভাঙা মধু’ (১৯৬৯), ‘নেকড়ে’ (১৯৬৮), ‘কেনারাম বেচারাম’ (১৯৭০), ‘পরবাস’ (১৯৭০), ‘সাজানো বাগান’ (১৯৭৭), ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’ (১৯৮৮), ‘শোভাযাত্রা’ (১৯৯০) ‘দর্পণে শরৎশশী’ (১৯৯১), এবং ‘আত্মগোপন’(১৯৯৪) প্রভৃতি। তাঁর নাটক সম্পর্কে অশোক মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য–

> “লোভ, বোকামি, ভন্ডামি, নষ্টামি দেখলে তাঁর (মনোজ মিত্রের) কলম তরবারির ধার পেয়ে যায়। সাধু সন্তের ভেকধরা ধর্মীয় জালিয়াতদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কত যে গুইবাবা, মৌনীবাবা, দাড়িবাবা-র মুখোস তিনি নির্মম হাতে টেনে খুলেছেন তাঁর সারাজীবনের লেখায় তার আর ইয়ত্তা নেই। রাজনীতির ভেকধারী নেতার ছদ্মবেশে অপদার্থ-কামুক-অত্যাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কি কম হেনস্থা হয়েছে তাঁর হাতে। তেমনি সংসারের ছোট আঙিনায় ছোট স্বার্থ, ক্ষুদ্র কূটবুদ্ধি, ছোট ছোট নিষ্ঠুরতাকেও মেলে ধরেছেন মনোজ।”[২]

তাঁর ‘নাটক সমগ্র’ থেকে তিনটি নাটক নির্বাচিত করে সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা গুলো কতখানি প্রস্ফুটিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। নির্বাচিত নাটকগুলো হল– ‘চাক ভাঙা মধু’, ‘সাজানো বাগান’ এবং ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’। নাট্যকার মনোজ মিত্রের ‘চাক ভাঙা মধু’ পূর্ণাঙ্গ নাটকটি ১৯৬৯ তে রচিত হলেও ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’ এর প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয় ১৬ মে ১৯৭২ সালে। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। এই নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকের মূল বিষয় জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের লড়াই। এই দুই শ্রেণির প্রধান চরিত্র গুলো হল– অঘোর, শঙ্কর, বাদামী, মাতলা এবং জটা। নাটকের প্রথমে মাতলা এবং বাদামীর কথোপকথনে দারিদ্রতার পরিচয় পাই। খাবারের সন্ধানে মাতলা সকালবেলা বাড়ি থেকে বার হয়েছে। খাবারের আশায় বাড়িতে বসে আছে গর্ভবতী মেয়ে এবং বৃদ্ধ কাকা। মাতলা মধুর ভান্ডে গোখরো সাপ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। মাতলা গোখরো সাপকে পোষ মানাতে চায় এবং মরার সময় পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে চায় যারা তাঁর সর্বনাশ করেছে তাদের দিকে। এদিকে ক্ষুধার তাড়নায় বাদামী কাঁদতে শুরু করে, কাকা জটা তিন দিন থেকে অনাহারে। অপরদিকে বাদামীর সন্তান জন্মের সময় টাকার প্রয়োজন আছে। আবার মহাজনের কাছে টাকার ব্যবস্থা করতে হলে ভিটেখানা বাঁধা রাখতে হবে। অভাবের তাড়নায় জটা বাদামীর পেটের সন্তানকে নষ্ট করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে মাতলাকে। কিন্তু মাতলা এতে রাজি নয় সবকিছুর বিনিময়েও নবজাতক সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাবেই। কিন্তু পরমুহূর্তে নাটকের মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়। জটা খবর আনে সুদ আদায়কারী অঘোর ঘোষ সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে গ্রামের সবাই খুশি। কারণ বকেয়া সুদ আর তাদের দিতে

হবে না। গ্রামের কেউ তাদের বিপদে সাহায্য করতে রাজি নয়। কোন উপায় না দেখে মৃত্যু পথযাত্রী অঘোরকে মাতলার বাড়িতে নিয়ে আসে সাপের বিষ ঝাড়ানোর জন্য। অঘোরকে বাঁচিয়ে তুলতে নারাজ, তাই জটা মাতলাকে পরামর্শ দিয়েছে—

> "... তা বলে রুগীর গায়ে হাত দিবিনে। খালি – উদিক ছুতোয় লাতায় ঘুরবি, ফিরবি, এট্টা করে ফ্যাচাং বার করবি - ওষুধ লাড়াচাড়া করবি - গাঁইগুই করবি - মানে সুমায় লষ্ট করবি বস্...।"[৩]

বেশি দেরি হবে তবেই তো প্রানে বাঁচা অসাধ্য হয়ে উঠবে। বাদামী কিন্তু অঘোর বাবুকে বাঁচাতে চাই। এখানে বাদামীর উদ্দেশ্যে জটা যেসব কথা বলেছে তাতে সমাজের কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

> "বাদামী।। আমি তারে ইখানে ডেকেছি, আমি উয়ারে ফেরাতি পারবো না।
>
> জটা।। আরে তোরে যে শ্মশানে যাতি নেই, বাগানে যাতি নেই, পোয়াতিরে যে এসময় ভূতপেরেত সাপখোপের থে দূরে থাকতি হয় – (বাদামীর গলার মাদুলিটা দেখিয়ে) এইডা কেনে আছে জানিসনে?"[৪]

বাদামীর অঘোরকে বাঁচানোর আর একটি কারণ হল- প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায়, হয়তো সারা বছরের খাজনা মাপ কিংবা কোন জমি যদি দেয়। অঘোরের পুত্র আড়তদার মানুষ শঙ্কর, সে জাত-পাতের বিচার না করে বাদামীদের উঠোনে বসে পড়ে এবং তাদের বাড়িতে জল খাই। শঙ্করের এই ব্যবহারে বাদামীর মন আর নরম হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ সম্পর্কে বাদামী বলেছে–

> "পোড়ারমুখো গাঁর মান্সে বোঝে না, শুধু বাপ বলে কথা না, যে কোন এট্টা মানুষ মরতি দেখলি কী যে বিষম কষ্ট হয়, ভেতরটা যেন কি রকম করতি লাগে।"[৫]

অঘোরের হাতে তাদের হেনস্থা, নির্যাতন কিভাবে হতে হয় জটা এবং মাতলা বাদামীকে তাদের সেই দুঃখের কথা শোনায়।

> "মাতলা।। হাঁ বলি, বলি দুঃখের কথা ! কেনে যখন সুদির বদলি জমিখান লিখে ন্যায়...
>
> জটা।। বাসনকোসন বিছানা মাদুর টেনে ঘরদোর ফর্সা করে দ্যায়...
>
> মাতলা।। আমার বুড়ো শুয়োরডারে হাটে নে গে ফেলে কেটে ভাগা দ্যায়...
>
> জটা।। পেছনের কাপড় তুলে ঠ্যাঙায়...
>
> মাতলা।। তখন মান্সের কষ্ট হয় না ? দুঃখু হয় না ? বেদনা হয় না?"[৬]

শঙ্কর তাদের মতিগতি বুঝতে পেরে নিজের চতুর বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে চাই। এ সম্পর্কে শঙ্কর দাক্ষায়িণীকে বলেছে—

> " ...হরদিনেই খদ্দেরের গলা কাটলে একদিন না একদিন সে তোমার দাঁড়ি ধরে টান মারবেই - বুঝতে হয়। তোমাদের দৌড় আমি খুব বুঝেছি, এখন সরে পড়ো তো, আমার মতো আমায় এগুতে দাও ...।'[৭]

তাদের কাছে সহানুভূতি আদায় করার জন্য শঙ্কর নিজেই তাঁর বাবাকে পাষণ্ড, সুদখোর, চশমখোর বলেছে। এছাড়াও বাদামীকে সুখী সংসারের প্রলোভন দেখিয়েছে। শঙ্কর জটা – মাতলার অনুপস্থিতিতে বাদামীকে বলেছে—

> "বাদাম ! আমার কথা শোন্। হরিশ লোকটা অভাবে পড়ে তোকে ছেড়েছে। ওই অঘোর ঘোষকে দিয়ে আমি তোদের সব অভাব মিটিয়ে দেব। আমি আড়তদার মানুষ- স্পষ্টাপষ্টি কথা। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে দে, আমি দেখব - হরিশ, তুই আর তোদের বাচ্চাটা যেন বাঁচে! ভালোভাবে বাঁচে!"[৮]

এই কথা শুনে বাদামী আশায় আনন্দে আত্মহারা। বুকে একরাশ আশা নিয়ে তাঁর বাবাকে অনুরোধ করেছে অঘোরকে বাঁচানোর। "বাঁচায়ে দ্যাও। কি হবে ট্যাকায়, কি হবে পয়সায়- ও বাপ, তুমি না ওঝা।"[৯]

অঘোর প্রাণ ফিরে পেতেই যেন সব কিছু পাল্টে যায়। দাক্ষায়িণী, অঘোর এবং শঙ্কর পুরাতন ছন্দে ফিরে এসেছে। তাই প্রাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঘোর মাতলাকে সুদ চেয়ে বসে। তার লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে গর্ভবতী বাদামীর দিকে, তাকে জোর করে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। বাদামী যেতে রাজি হয়। কিন্তু যাওয়ার আগে 'চাক ভাঙা মধু'র কলসি থেকে বার করে বিষাক্ত সাপ, তা দেখে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু গ্রামবাসী সকলে তাকে ঘিরে ধরে। প্রতিঘাত আসে শুধুমাত্র বাদামীর হাত থেকে। কচ্ছপ ধরা সড়কি চালিয়ে দেয় অঘোরের বুকে। নাট্যব্যক্তিত্ত অজিতকুমার ঘোষ এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন–

> "অঘোর ঘোষ বাঁচিয়া উঠিল বটে, কিন্তু প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াই সে তাহার কুৎসিত লালসার বিষাক্ত মূর্তি ধারণ করিল। অবশেষে সে তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইল এবং সেই শাস্তি পাইল তাহারই হাতে যে তাহাকে কিছুক্ষণ আগেই একরকম বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার ক্ষণে ক্ষণে নাটকের মধ্যে শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা

> উত্তেজনাজনক চমকের দ্বারা আমাদের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আঞ্চলিক ভাষা এবং ঝলসানো শব্দের তীক্ষ্ণ প্রখরতা দ্বারা তিনি নাটকের সংলাপকে মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছেন।"[১০]

শোষক এবং শোষিতের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শোষিতদের জয় দেখানো হয়েছে। সাধারণ শ্রেণির মানুষগুলো জীবনের অসীম যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে অঘোর ঘোষের মৃত্যুকামনা করেছে। কারণ তিনি বেঁচে থাকলে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। নাট্যকার মনোজ মিত্রের শ্রেণিদ্বন্দ্ব সম্পর্কে নাট্যসমালোচ পবিত্র সরকারের মন্তব্য –

> "তাদের শ্রেণীর প্রতিবাদ ও ক্রোধ তাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে চায়- কিন্তু মনোজ মিত্র সেটা ধীরে সুস্থে, জটা-মাতলা-বাদামীর নানা মজাদার ও বিপন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি করেন, দর্শক বা পাঠকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে একেবারেই বুঝিয়ে দেন না।"[১১]

আমার আলোচ্য দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক হল 'সাজানো বাগান'। নাটকটি লেখা হয় ১৯৭৬-১৯৭৭ তে। নির্দেশনার কাজ স্বয়ং মনোজ মিত্র করেছেন। নাটকটির জনপ্রিয়তার জন্য 'বাঞ্ছারামের বাগান' নামে সিনেমা হয়। এই নাটক সমাজভাবনার দিক থেকে 'চাক ভাঙা মধু' এর সমগোত্রীয়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক অশোক মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য –

> "চাকভাঙা মধু-র আদিম অন্ধকারময় গ্রামকে ছাড়িয়ে এসে নতুন গ্রামের চেহারা আঁকেন মনোজ,'সাজানো বাগান'এ। ছকড়ি-নকড়ি এখানে জোতদার হয়েও যাকে বলে টেবিলের অন্য প্রান্তে। অঘোর ঘোষের প্রবল দাপটের বদলে এরা আশ্রয় নিয়েছে ছলচাতুরির, কৌশলের।"[১২]

বাঞ্ছারামের বাগানকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো হল-বাঞ্ছারাম কাপালি, ছকড়ি দত্ত, নকড়ি দত্ত এবং গুপি। বৃদ্ধ চাষী বাঞ্ছারামের ফলের বাগানের উপর জমিদার ছকড়ি দত্তের নজর ছিল। যখন সে বেঁচেছিল তখন নিজের হস্তগত করতে পারেনি তাই মরার পরেও বাগানের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। তাই তাঁর প্রেতাত্মা এখনও বাগানের আসে পাশে ঘুরতে থাকে। ছকড়ির পুত্র নকড়ির এখন বাগানের প্রতি প্রচুর লোভ। বৃদ্ধ বাঞ্ছা বাগানের দেখভাল আর আগের মতো করতে পারে না। তাঁর একমাত্র সহায় ছিল তার নাতি গুপি। গুপির আবদার ছিল বাগান বিক্রি করে ব্যবসা করার কিন্তু বাঞ্ছা কোন কিছুর বিনিময়েও বাগান হাতছাড়া করতে চায় না। শুরু হয় তাদের কথা কাটাকাটি। নকড়ি গুপিকে এখান থেকে তাড়ানোর এই সুবর্নসুযোগ কাজে লাগায় এবং সফলও হয়। বাঞ্ছার সারাজীবনের ভরণপোষণের এবং বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। এতদিন বাঞ্ছা বাগান আগলে রেখেছিল লাঠির জোরে কিন্তু নকড়ির চাতুরির কাছে হেরে যায়। নকড়ি পরিস্কার জানিয়ে দেয়–

> 'নকড়ি।। হ্যাঁ, আজ থেকে এ সম্পত্তির সব ভার আমি নিলাম। তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ সব আমার। আরে, বাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো না?
> [কৃতজ্ঞতায় বাঞ্ছা নকড়ির পা জড়িয়ে কাঁদে]
> শোনো, প্রতিমাসে পয়লা তারিখে দুখানা করে বড় পাত্তি দেবো- যতদিন জীবিত আছো মাসে মাসে দু'শো করে দিয়ে যাবো।'[১৩]

তিনি এটাও জানিয়ে দেয় যে, 'আমার শুধু একটা কন্ডিশন। তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান- টাগান সব আমার হবে...।'[১৪] এখানেই শেষ নয়, এরপর থেকেই বাঞ্ছার জীবনের পিছনে পড়ে থাকে নকড়ি দত্ত। বাঞ্ছার শরীর খারাপ তাই গোবিন্দ ডাক্তার ঔষধ দিতে চেয়েছে কিন্তু নকড়ি বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু গণৎকারকে দিয়ে আয়ু এবং মরার দিনক্ষণ জানতে চেয়েছে। শেষে বাঞ্ছাকে জিজ্ঞাসা করেছে– "ভাই বাঞ্ছা, একটা পরিস্কার কথা দাও দিকি, তুমি কবে মরবে?"[১৫]
এর পরের দৃশ্যেই দেখি, অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে গুপি নতুন বৌ পদ্মরাণীকে নিয়ে বাঞ্ছার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। বুড়োর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে গুপি ফিরে যেতে চেয়েছে কিন্তু পদ্ম যেতে চায়নি। পদ্ম গুপিকে বলেছে– মরার আগে তো জমিদার তাদের এ বাড়ি থেকে বার করতে পারবে না, তাই যতদিন সম্ভব বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। বাঞ্ছার জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হয় একপক্ষ মৃত্যুকামনা করে আর একপক্ষ দীর্ঘজীবির কামনা করে।

আমরা দেখি, বাঞ্ছা কাপালি বারবার মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছে। একটুখানি স্বার্থের জন্য একটা মানুষের জীবন নগণ্য হয়ে যায়। পুলিশে দেওয়ার ধমকি, যুব অফিসে নিয়ে যাওয়ার ধমকি, টাকার প্রলোভন দেখিয়ে গুপির হাতে বাঞ্ছার হত্যা এবং মোক্তার আর নকড়ির মিলিত ভাবে বাঞ্ছাকে গলা টিপে মারার প্ল্যান সব ভেস্তে যায়। এদিকে পদ্মের

হাতে সেবাযত্ন পেয়ে বাঞ্ছা আরও সুস্থ হয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে মৃত্যু কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বাঞ্ছার হাতে 'ফলিডল' নামক বিষ তুলে দিয়েছে। মৃত্যুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে কেউ মৃত্যু রহস্যের টের না পাই। মড়া শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি হয়ে থাকে, যেই পদ্মের কান্না শুনতে পেয়েছে অমনি বাঞ্ছার উঠোনে হাজির হয়েছে সকলে। প্রেতাত্মা ছকড়ি ও নকড়ি এসে দেখে প্ল্যানের সব উল্টো হয়ে আছে। পদ্মের কান্না আসলে বাঞ্ছার মৃত্যুর জন্য নয়, নবজাতকের আগমণের জন্য। নবজাতকের কান্নায় যেন বাঞ্ছা চেতনা ফিরে পেয়েছে। সে নকড়িকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে–

> "এট্টা কথা বলি কত্তা, আমি মরতে পারব না! আজ্ঞে বাচ্চাটার পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে! আমি ওরে নাড়ি কেটে ধরায় এনেছি, এখন ওরে ভাসায় যাব কী করে? কত্তা, আমি আর মরতে পারবো না!"[১৬]

বাঞ্ছা ফলিডল ফেরৎ দেওয়ার আগেই কর্তা মারা যায়। নকড়ি বাঞ্ছার কথা শুনে বাগান না পাওয়ার হতাশায় মারা যায়। এখানে শোষিত শ্রেণির জয় হয়েছে। সমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা বলেছেন–

> "মুখ্যু চাষীর অধিকার রাখার যে লড়াই, জমি নিয়ে বাঁচা – মরার যুযুৎসুর এই প্যাঁচ রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সরল পথ ধরে আসেনি বলেই যে সাজানো বাগান প্রগতিশীল চিন্তা ধারার ফসল নয় এমন কোন সরল সিদ্ধান্তে না পোঁছে আমরা বরং বলতে পারি শোষক - শোষিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'চাক ভাঙা মধু'র নাট্যকার 'সাজানো বাগানে' পোঁছে শোষক শ্রেণীর মুখের উপর তোমার ফলিডল তুমিই বরং খাও বলার সাহস জুগিয়ে দিয়েছে।"[১৭]

সমাজের শোষক শ্রেণীকে অপদেবতা রূপে চিহ্নিত করেছেন নাট্যকার। নাটকে মাঝে মাঝে এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রেতাত্মা ছকড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে অপদেবতাররূপী শোষকের নিখুঁত চিত্র বর্ণনা করেছেন। বাঞ্ছা কাপালি প্রেতাত্মা সম্বন্ধে পদ্মকে বলেছে–

> "আছেরে বৌ, ভূত আছে! কদ্দিন বলে আসছি, ঐ বাগানটা করার পর থেকেই এট্টা ভূত আমার পেছনে লেগেছে! এট্টা কালা অপছায়া আমার সবুজ লতাপাতা ফলফুলুরি ঘিরে ধরেছে! -কতো তাড়াই—ছায়াটা সরে না! -যুগ যুগ চলে যাবে -ওই অপদেবতা পিথিবির যেখানে যতো ফসল - সব গেরাস করবে বলে বসে থাকবে! - কিছুতেই ওরে কাটানো যাবে না রে!"[১৮]

শেষে দেখি, নকড়ির মৃত্যুর সাথে সাথে লোভ, শোষণ, পীড়ণ, সমস্ত কিছু কেটে গেছে। বাঞ্ছার জীবনের অন্ধকার, সমাজের অন্ধকার এবং প্রকৃতির অন্ধকার নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নাট্যকার নবজাতকের মধ্য দিয়ে এক নতুন ভোরের সুচনা করেছেন। বাঞ্ছার মতো মানুষের হাত দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাতে চাই। তাইতো মৃত্যুপথযাত্রী ' সাজানো বাগানের মালিক বাঞ্ছা কাপালির জীবন প্রদীপ নাট্যকার নিভতে দেয়নি। তাই বাঞ্ছার জবানীতে নাট্যকারের উক্তি– "... সব তোমারে দিয়ে যাবো- তোমার জন্যই তো সাজায়ে রেখেছি গো।"[১৯] নতুন ভোরে নতুন প্রজন্মের কাছে সুস্থ পৃথিবীর অঙ্গীকারেই নাটক শেষ হয়। এ নাটক সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য–

> "মনোজ মিত্রের নাটকে এভাবে জীবনের অন্তিম জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কৌতুকের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা সমস্ত নাটকটিকে দীপ্ত ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঞ্ছারামের বাগান স্বার্থপর অর্থলোভীর হাতে পড়িয়া ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু নবজীবনের কান্না তাহার পত্রপুস্পশাখায় শাখায় বিচিত্র রঙ রূপ ও রসের প্লাবন আনিয়া দিল। বিবর্ণ বিরস বাগান আবার সাজানো বাগান হইয়া উঠিল।"[২০]

আলোচ্য দুটি নাটকেই শোষিত শ্রেণীর জয় দেখানো হয়েছে। নাট্যকার আসলে এটাই চান যে, সমাজের দমন-পীড়ণ সহ্যকারী মানুষ গুলো যেন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, নিজেদের লড়াই নিজেরা লড়ে তাদের প্রাপ্য হক ছিনিয়ে নিতে পারে শোষক শ্রেণির কাছ থেকে। এ সম্পর্কে সমাজসচেতন নাট্যকার মনোজ মিত্রের মন্তব্য–

> "ইহজীবনের জরুরি সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ ধরেনি। উৎপীড়ন অনাচার অবিচার ভন্ডামি চারপাশের যত শয়তানির মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে নির্মমভাবে ও ব্যতিক্রমহীনভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ।"[২১]

আমার অলোচ্য তৃতীয় নাটক হল 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৯০)। উপরে উল্লেখিত দুটি নাটকের থেকে এটি সম্পুর্ণ আলাদা। এখানে শ্রেণীসংগ্রাম নয় মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনসংগ্রামের চিত্রটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাটকের

প্রধান চরিত্র গুলো হল– অলকানন্দা, জয়দীপ, শুভ, দেবাহুতি, রজনীনাথ, বাদল এবং পার্থ প্রমুখ। সংসার নামক নৌকার একমাত্র মাঝি অলকানন্দা। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষিকা। অলকা নিঃসন্তান, অনাথ দুটো ছেলেমেয়েকে নিজের সঃন্তানের মতো করে লালন পালন করেছেন। তার মেয়ে মানসী এবং ছেলে শুভ। বাড়ির কর্তা রজনীনাথ পঙ্গু হয়ে বাড়িতে বসে, তাই সংসারের সব দায়িত্ব অলকার উপর। মানসীর বিয়ে হয়ে গেছে আর শুভ কলেজে পড়ে। এদেরকে নিয়ে তার সংসার।

অলকাদের যখন সংসারের অবস্থা ভালো ছিল তখন শুভ ও মানসীকে ঘরে তুলেছিল কিন্তু এখন সামাল দিতে অপারগ। জমানো যা অবশিষ্ট টাকা পয়সা তা মানসীর বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে। মানসী শ্বশুরবাড়িতে আছে তবু অলকার চিন্তা লেগেই থাকে। কারণ মানসীকে সেখানে নির্যাতিত হতে হয়। তাই মায়ের মন সব সময় চিন্তায় থাকে—

> "...ভগবান আমার বোকাসোকা মেয়েটার কপাল পুড়ল না খুলল - কিছুই জানতে পারছিনে। কোথায় ধানবাদে মৃগেনের সঙ্গে তার মিলমিশ হলো কিনা - মৃগেন তাকে ভালোবাসে কিনা।"[২২]

শুভ কলেজে পড়ে, সময়মতো তাকে আবার টাকা পাঠাতে হয়। হাজার টাকা দিতে পারেনি বলে শুভ বাড়িতে হাজির হয়েছে সঙ্গে র‍্যাগিং এর লিডার জয়দীপ। টাকা দিতে না পারলে শুভকে গলা কাটার ভয় দেখিয়েছে। কারণ কলেজের প্রথম দিনেই শুভ র‍্যাগিং এর জালে জড়িয়ে পড়েছে। একটা গরীব মেয়ের ধর্ষণের অভিযোগ শুভ'র উপর চাপিয়ে দিয়ে মোটা টাকার দাবি করে নাহলে বিষয়টা সবাইকে জানিয়ে দেবে জয়দীপ। টাকার জন্য মায়ের সাথে ঝগড়া করে সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। নিজের বোনের সাথে হিংসে করেছে। অলকাকে প্রশ্ন করেছে কেন মানসীকে ভাগীদার করে অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে এসেছিল। শুভর কাছে এইসব কথা শুনে অলকা রাগে আত্মহারা হয়ে তার গালে চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু শুভ কোন ভ্রুক্ষেপ না করে টাকা ম্যানেজ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। টাকার সন্ধানে হাজির হয় বড়লোক বাপের বাড়িতে। তার জন্মদাতা পিতা অলকাকে জানায়–

> "...হয়ত টাকাটা ওকে দিয়েই দিতাম কিন্তু ও যখন অনর্গল আপনাদের সকলকে দুষতে লাগল ওর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্যে - ঐ মতিচ্ছন্ন লোভী ছেলেটাকে আমি দূর করে দিয়েছি বাড়ি থেকে।"[২৩]

শুভ মনের কথা কাউকে বলতে না পেরে মানসিক চাপে সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। তবু শেষপর্যন্ত র‍্যাগিং এর জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। মিথ্যে অভিযোগ মেনে নিতে না পেরে শুভ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। শুভ'র সম্পর্কে বাদলের সংলাপে র‍্যাগিং এর ভয়াবহতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

> "যদুপতি।। ডাক্তার কি বলেছে,
> বাদল।। ভালো না - ভরসা পাচ্ছিনে দাদা। কাল বিকেলে অ্যাসাইলামে গিয়ে দেখি শক্ত দড়ি দিয়ে ওর হাত-পা বাঁধা! আমাকে দেখে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠলো! উঃ র‍্যাগিং যে এরকম ভয়ঙ্কর হতে পারে! আর কী একটা সময় পড়েছে- সমাজের সবখানেই কিরকম র‍্যাগিং চলছে না! অবশ্য তুমিই ভালো বলতে পারবে। কিন্তু মানুষ অকারণে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কী যে মজা পাচ্ছে! দ্যাখো, আমাদের ছেলেটার মাথাটাই নষ্ট হয়ে গেল!"[২৪]

নাটকের শেষে দেখি, অলকা পাশের বাড়ির মহিলা দেবাহুতির সন্তানকে দত্তক নিয়েছে। কারণ শুভ এবং মানসী আর তার কাছে ফিরে আসবে না। তিনি মনে করেন –

> "...শুভ মানসীর জন্যে ঘরে বসে কাঁদা ছাড়া আর এখন কী করতে পারি আম ! আমার কেয়াপাতার নৌকোদুটো নোঙর ছিঁড়ে ছুটে গেছে ভরা গাঙের মধ্যিখানে - উথাল পাথাল ঢেউ - হয়ত ভাসবে - হয়ত ডুববে - আমি কূলে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখব! তার চেয়ে আর একটা নৌকো গড়ি না কেন - গড়ার চেষ্টা করি না কেন..."[২৫]

সমাজে এক ধরণের মানুষ আছে যারা সমস্যা ও সংকটকে সঙ্গে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চাই, এতেই তাদের আনন্দ। অলকানন্দাও এই ধরণের ছিলেন। সহৃদয়তা মানবিকতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সব গুণ অলকানন্দার চরিত্রে বিরাজমান। অপরদিকে অলকানন্দার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র দেবাহুতি। দেবাহুতির সংসারে মন বসে না, ছোট শিশুকে বাড়িতে ফেলে রেখে বাইরে যায়, ঠিকমতো দেখাশোনা করে না। তাই খুব সহজেই অলকানন্দার চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরদিকে, র‍্যাগিং এর মতো মর্মান্তিক ঘটনাকে শুভ এবং জয়দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই নাটক সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ত অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য—

"নাটকের মধ্যে মূল কাহিনীধারার সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক বাস্তব সমস্যা জড়াইয়া আছে। র‍্যাগিং যে ছাত্রজীবনের কি সর্বনাশ ঘটাইতে পারে শুভর মত একটি নিষ্পাপ সম্ভাবনাময় তরুণের ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা গেল। জয়দীপের মত র‍্যাগিংমাস্টাররা ওই ময়াল সাপের মতই পাকে পাকে জড়াইয়া তরুণ প্রাণগুলি নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। দেবাহুতির মত উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসমান নারী যে কিরূপ আত্মহননের সর্বনাশা পথে চলিয়াছে নাট্যকার তাহাই দেখাইয়াছেন। আর মানসীর মত একটি মেয়ে বিবাহের স্বপ্নস্বর্গ হইতে এক উত্তপ্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইল, ইহা অপেক্ষা জীবনের শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে! এই সব দুঃখকষ্ট সমস্যা সংকটের মধ্যে অলকানন্দার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ঊর্ধ্বে বিরাজিত। সংসারে এখনো অলকানন্দা আছে, পুত্রকন্যাদের ভয় কিসের!"[২৬]

পরিশেষে বলা যায়, নাট্যকার মনোজ মিত্রকে বাস্তব সমাজের রূপকার বললেও কিছু ক্ষতি হবে না। সমাজের শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবনা তিনি তাঁর নাটকগুলোতে নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপরে উল্লেখিত নাটক দুটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি নাটকেই শোষক জমিদার শ্রেণির মুখোশ খুলে ফেলেছেন। সমাজের শোষক শ্রেণির চরম পরিণতি দিয়েছেন এবং দুর্বল শোষিত মানুষগুলোকে জিতিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো কোন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু উপলব্ধি করেছেন সেটাই হয়ে উঠেছে নাটকের বিষয়বস্তু। তাই সময় অনুসারে তাঁর নাট্যভাবনা বা সমাজভাবনা পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর ভাষা-সংলাপ পাঠক বা দর্শকের মনে সহজেই জায়গা করে নেই। 'মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র' এর ভূমিকায় পবিত্র সরকার বলেছেন –

"খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যেরকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা, এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।"[২৭]

তিনি আধুনিক সমাজের বাস্তব সমস্যা গুলোকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। সুন্দর সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন নাটকের চরিত্র গুলোর মধ্য দিয়ে। বার্তা দিয়েছেন নতুন ভাবে বাঁচার এবং পথচলার।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ (সম্পাদিত), সোনার পুর কৃষ্টি সংসদের মুখপত্র, ১৯৮৫ ডিসেম্বর, পৃ. ৬
২. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃ. ৬
৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০, পৃ. ২১
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. তদেব, পৃ. ৩০
৬. তদেব, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৩৯
৯. তদেব, পৃ. ৪০
১০. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪৩৪
১১. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০, পৃ. ৬
১২. মুখোপাধ্যায়, অশোক, সাজানো বাগান, বারোমাস, জুলাই ১৯৭৮
১৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ১০

১৪. তদেব, পৃ. ১০
১৫. তদেব, পৃ. ১৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৯
১৭. সাহা, নৃপেন্দ্র, গ্রুপ থিয়েটার, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৮
১৮. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৩৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪৯
২০. ঘোষ, অজিতকুমার,বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪৩৪
২১. মিত্র, মনোজ, বাংলা নাট্য হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, সৃষ্টি প্রকাশন, বইমেলা ২০০১, পৃ. ৩২
২২. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, কলিকাতা– ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০, পৃ. ১৬৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৮৯
২৪. তদেব, পৃ. ১৯২
২৫. তদেব, পৃ. ১৯৯
২৬. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪৩৬
২৭. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৯